Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-III, April 2024, Page No.137-148
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

আধুনিক বাংলা কবিতায় উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ

ড. প্রদীপ কুমার পাত্র

রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজর শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, পি. আর. এম. এস. মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Legacy is future generations — in whose hands lies the wheel of future progress. Inheritance may or may not be inherited. Future generations are simply called inheritance. It is true that even though they are not always related by blood, there is a kinship of the heart. Hence inheritance is used in a broad sense and not in a narrow sense. Modern poets have beautifully expressed this legacy in their poems. In modern Bengali poetry, the theme of inheritance has come up in many ways. Love for future generations can be observed in every sensitive person. The poets have expressed the subject sometimes with the background of history and sometimes with the help of mythological associations. Many poets have expressed the desire to protect the new generation from the hostile environment.
Keywords: Legacy, Future Generation, Progress, Modern, Sensitive, History, Mythic, Multilinear.

কবি গোলাম মোস্তফা(১৮৯৭ খ্রি. - ১৯৬৪ খ্রি.) 'কিশোর' কবিতায় লিখেছেন—

"ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।"

এই কবিতায় কবি উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন। উত্তরাধিকার হল পরবর্তী প্রজন্ম — যাদের হাতে ভবিষ্যতের অগ্রগতির চাকা অগ্রসরের মন্ত্র নিহিত রয়েছে। উত্তরাধিকার আত্মজ হতেও পারে, নাও পারে। পরবর্তী প্রজন্মকে-ই এক কথায় উত্তরাধিকার বলা হয়। এই কথা ঠিক যে, এদের সঙ্গে সবসময় রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও হৃদয়ের আত্মীয়তা রয়েছে। তাই উত্তরাধিকার কোনো সংকীর্ণ অর্থ নয়, ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার ভালোবাসা সভ্যতা সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে লক্ষ করা যায়। এই স্নেহ, আদিম প্রবৃত্তিজাত। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার এই ভালোবাসা শুধুমাত্র মানবসমাজে দেখা যায় এমন নয়, মানবেতর প্রাণীর মধ্যেও সমানভাবে রয়েছে। প্রাণীজগতের এই অপত্য স্নেহ সাহিত্যিকেরা সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। পশু-পাখির অপত্য স্নেহ আমরা 'ঈশপ ফেবল'-এ লক্ষ করি। সংস্কৃত সাহিত্যে উত্তরাধিকারের প্রতি ভালোবাসা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উঠে এসেছে। উদাহরণ হিসাবে— কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্', 'কুমারসম্ভব', শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক'-এর কথা বলা যায়। কবি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'(১৭৫২ খ্রি.) কাব্যে ঈশ্বরী পাটুনীর— 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' কথাটির মধ্য দিয়ে উত্তরাধিকারের প্রতি শাশ্বত ভালোবাসার সুর শ্রুত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন',

‘দেনাপাওনা’, ‘সুভা’, ‘কাবুলিওয়ালা’ প্রভৃতি গল্পে পিতৃরস যেন ঝর্ণার মতো ঝরে পড়েছে। আধুনিক বাংলা কবিতায় উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ বড়ো জায়গাজুড়ে রয়েছে।

এখন প্রশ্ন, আধুনিক কী। আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা কী — এই প্রশ্নের কোনো একক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রমুখ সাহিত্যস্রষ্টারা আধুনিক কবিতার ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘সাহিত্যের পথে’(১৯৩৬ খ্রি.) প্রবন্ধগ্রন্থের ‘আধুনিক কাব্য’ প্রবন্ধে আধুনিক বিষয় লিখেছেন— “নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডারন্। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।”[১] আধুনিক কবিরা কালচেতনা থেকে মর্জি বা চিন্তা-চেতনার প্রতি বেশি আস্থা রেখেছেন। আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা, বিষয়, বৈশিষ্ট্য নিয়ে সাহিত্যস্রষ্টাদের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও এই কথা ঠিক যে, আধুনিক কবিতার প্রকৃত পথ পরিক্রমা শুরু হয়েছে বিশ শতকের তিরিশের দশকের— জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯ খ্রি. - ১৯৫৪ খ্রি.), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১ খ্রি. -১৯৬০খ্রি.), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১ খ্রি. - ১৯৮৬ খ্রি.), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩ খ্রি. - ১৯৭৬ খ্রি.), জসীম উদ্দীন(১৯০৩ খ্রি. - ১৯৭৬ খ্রি.), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪ খ্রি. - ১৯৮৮ খ্রি.), অজিত দত্ত (১৯০৭ খ্রি. - ১৯৭৯ খ্রি.), বুদ্ধদেব বসু(১৯০৮ খ্রি. - ১৯৭৪ খ্রি.), বিষ্ণু দে (১৯০৯ খ্রি. - ১৯৮২ খ্রি.), সমর সেন (১৯১৬ খ্রি. - ১৯৮৭ খ্রি.) প্রমুখ কবিদের হাত ধরে। সমকাললগ্নতা, চিরায়ত উপলব্ধি, গ্রামীণ ও নাগরিক জীবনের টানাপোড়েন, শিল্পকলা ও সাহিত্য আন্দোলন নানা অনুষঙ্গ, দর্শনগত চিন্তা-চেতনা, অস্তিত্ববাদ, নারীবাদ, দেশি-বিদেশি পুরাণ পরিগ্রহণ, লোকসংস্কৃতির নানা দিক পরিবেশন প্রভৃতি বিষয় আধুনিক বাংলা কবিতার প্রধান অবলম্বন। এইসব উপাদান কবিতায় প্রকাশ করতে গিয়ে কবিরা বহুরৈখিকভাবে উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ গ্রহণ করেছেন।

বিশ শতকের চল্লিশের দশকের কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের(১৯২৬ খ্রি. - ১৯৪৭ খ্রি.) ‘ছাড়পত্র’(১৯৪৮ খ্রি.) কাব্যের ‘আগামী’ ও ‘ছাড়পত্র’ কবিতার দু’টিতে উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ রয়েছে। ‘আগামী’ কবিতায় কবি লিখেছেন—

> “জড় নই, মৃত নই, নই আমি অন্ধকারের খনিজ,
> আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ,”

এই কবিতায় কবি রূপকের সাহায্যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ইতিহাস ব্যক্ত করেছেন। একটি বীজ আকারে ক্ষুদ্র হলেও তার মধ্যে বড়ো বৃক্ষ তৈরি করার ক্ষমতা রয়েছে। তেমনই একটি শিশু আজ ছোট হলেও তার অন্তরে ভবিষ্যতের অগ্রগতির চাকা চালানোর ক্ষমতা বর্তমান। ঠিক একই কথা কবি গোলাম মোস্তফা ‘কিশোর’ কবিতায় বলেছেন।

কবি ‘ছাড়পত্র’(১৯৪৮ খ্রি.) কাব্যের কবিতাগুলি ১৯৪৩ খ্রিস্টাব থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ — এই সময় পর্বে রচনা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯ খ্রি. - ১৯৪৫ খ্রি.), ভারত-ছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২ খ্রি.), ‘মন্বন্তর’(১৯৪৩ খ্রি.), প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (১৯৪৬ খ্রি.) প্রভৃতি ঘটনা কবিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল — তার প্রত্যক্ষ ছাপ আমরা ‘ছাড়পত্র’ কাব্যের বেশ কিছু কবিতায় লক্ষ করি। বৈরী পরিবেশ সাধারণ মানুষের জীবন-যাপনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। বীভৎস প্রেক্ষাপটে মানুষ নিজেকে বিপন্নবোধ করেছে। এই রৌদ্র

করোটিময় সময়ে বিমুখ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে কবি উত্তরাধিকারদের একটি সুন্দর, স্বাস্থ্যল সমাজ দেওয়ার জন্য প্রতীক্ষা করেন। এই শপথ বাক্য তাঁর 'ছাড়পত্র' কবিতায় দেখা যায়—

'... যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি—
নবজাতকের কাছে এই আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।'

কবি জানেন— শিশুকে সতেজ, প্রাণবন্ত রাখলে সে ভবিষ্যতের পক্ষে সদর্থক ভূমিকা পালন করবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কবির এই মনোভাব সুষম সমাজ গঠনের পরিচয়বাহী।

বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'বন্দী জেগে আছো'(ফাল্গুন ১৩৭৫) কাব্যের 'উত্তরাধিকার' কবিতায় লিখেছেন—

"নবীন কিশোর, তোমাকে দিলাম ভুবনডাঙার মেঘলা আকাশ
তোমাকে দিলাম বোতামবিহীন ছেঁড়া শার্ট আর
ফুসফুস ভরা হাসি"

—এই কবিতায় কবি উত্তরাধিকারদের চিরায়ত অনুভূতির সমস্ত কিছু দিতে চান। সমস্ত দুঃখ, যন্ত্রণা থেকে সরিয়ে এনে সুখ-সমৃদ্ধ ভরা পৃথিবী দেওয়ার কথা বলেছেন। কবিতাটির শেষাংশে কবি জানিয়েছেন— 'তোমাকে আমার তোমার বয়সী সব কিছু দিতে বড় স্বাদ হয়।' এই কথাটি বুঝিয়ে দেয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি কবির ভালোবাসার প্রকৃত স্বর ও স্বরগ্রামকে।

বিশ শতকের ষাটের দশকের কবি শহীদ কাদরী(১৯৪২ খ্রি. - ২০১৬ খ্রি.) বাংলা কবিতার জগতে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। মফিদুল হক 'শহীদ কাদরীর কবিতা' গ্রন্থের 'প্রকাশকের নিবেদন' অংশে শহীদ কাদরীর কবিতা বিষয়ে মন্তব্য করেছেন— "সাতচল্লিশ-উত্তর কবিতাধারায় আধুনিক মনন ও জীবনবোধ সঞ্চারিত করে কবিতার রূপবদলের যাঁরা ছিলেন কারিগর, শহীদ কাদরী তাঁদের অন্যতম প্রধান। তাঁর কবিতা আমাদের নিয়ে যায় সম্পূর্ণ আলাদা এক জগতে, ঝলমলে বিশ্ব-নাগরিকতা বোধ ও গভীর স্বাদেশিকতার মিশেলে শব্দ, উপমা, উৎপ্রেক্ষার অভিনবত্বে তিনি যেন বিদ্যুচ্চমকের মতো এক ঝলকে সত্য উদ্ভাসন করে পর মুহূর্তে মিলিয়ে গেলেন দূর দিগন্তের নিভৃত নির্জনতার কোলে।"[২] শহীদ কাদরী যখন 'উত্তরাধিকার'(১৯৬৭ খ্রি.) কাব্যের কবিতাগুলি রচনা করেন তখন বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবেশ ছিল অস্থির, উত্তালময়। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান স্বৈরাচারী শাসন চালান। সমাজ যেন বিমুখ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছে। মানব সভ্যতা বৈরী পরিবেশের শিকার। তারা বিপন্ন, বিধ্বস্ত। এ-হেন প্রেক্ষাপটে উত্তরাধিকারদের আবির্ভাব ঘটে। 'উত্তরাধিকার' কবিতাটির প্রথমেই কবি লিখেছেন—

"জন্মেই কুঁকড়ে গেছি মাতৃজরায়ন থেকে নেমে—
সোনালি পিচ্ছিল পেট আমাকে উগরে দিলো যেন
দীপহীন ল্যাম্পপোস্টের নীচে, সন্ত্রস্ত শহরে
নিমজ্জিত সবকিছু, রুদ্ধচক্ষু সেই ব্ল্যাক-আউটে আঁধারে।"

কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘উত্তরাধিকার’ কবিতার সঙ্গে শহীদ কাদরীর ‘উত্তরাধিকার’ কবিতাটির বিষয় ভাবনায় এবং উপস্থাপনে পার্থক্য দেখা যায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যেখানে উত্তরাধিকারদের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়ার কথা বলেছেন, সেখানে শহীদ কাদরী সময়ের প্রতিকূল পরিবেশের বীভৎস ছবি এঁকেছেন। তাঁর (শহীদ কাদরী) কবিতায় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন সমকালের প্রেক্ষাপটে পৃষ্ট।

বিশ শতকের চল্লিশের দশকের কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়(১৯১৯ খ্রি. - ২০০৩ খ্রি.) এবং বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়(১৯২০ খ্রি. - ১৯৮৫ খ্রি.)-এর কবিতায় উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ রয়েছে — তবে তা সমকালের দুর্বিষহ পরিবেশে ক্ষতবিক্ষত রূপ। ষাট-সত্তর দশকের উত্তাল প্রেক্ষাপট ভবিষ্যত প্রজন্মের উপর যে হিংস্র থাবা বসিয়েছিল — এই দুই কবির কবিতায় তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ‘ছেলে আছে বনে’ (১৯৭২ খ্রি.) কাব্যের প্রেক্ষাপট হিসাবে নকশাল আন্দোলনকে গ্রহণ করেছেন। এই সময়পর্বে অগণিত তরতাজা তরুণ-তরুণী অকাতরে প্রাণ হারায়। কবি তাদের কথা তাঁর অনেক কবিতায় প্রকাশ করেছেন। উক্ত কাব্যের ‘ছেলে গেছে বনে’ কবিতার শেষাংশে জানিয়েছেন—

“ফেলে রেখে আমাকে বন্ধনে
ছেলে গেছে মনে।
অথচ তারই হাতে দেখছি মুক্তপাখা
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত
আমারই পতাকা।।”

ষাটের দশকের সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থির পরিবেশে সাধারণ মানুষ বিপর্যস্ত। ভবিষ্যত প্রজন্ম অমানিশার কালো মেঘে ঢাকা পড়েছে। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘আমার রাজা হওয়ার স্পর্ধা’(১৩৭১ বঙ্গাব্দ) কাব্যের ‘শিশুগুলি কেঁদে উঠলো’ কবিতায় ঘুণধরা সমাজব্যবস্থার ছবি রয়েছে—

“শিশুগুলি কেঁদে উঠলো এ-ওকে জড়িয়ে
ঘুণধরা অন্ধকার ঘরে;
তাদের পিতারা কবে গেছে জাহান্নমে
যে-যার বেশ্যাকে খুন করে …”

—এ যেন নগ্ন, বীভৎস সমাজের প্রতিচ্ছবি। নতুন প্রজন্ম যে কতখানি বিপন্ন — তার কথা কবি এই কবিতায় সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন।

কবি জীবনানন্দ দাশ ‘মহাপৃথিবী’(১৯৪৪ খ্রি.) কাব্যের ‘আট বছর আগের একদিন’ কবিতায় উত্তরাধিকারের প্রসঙ্গ এনেছেন—

“বধূ শুয়েছিলো পাশে — শিশুটিও ছিলো;
প্রেম ছিলো আশা ছিলো — জ্যোৎস্নায় - তবু সে দেখিল”।

শিশু হল দেশের ভবিষ্যৎ। তাদের হাতেই পরবর্তী পর্বের উন্নয়নের চাকা অগ্রসরের ক্ষমতা রয়েছে। কবিতায় উল্লিখিত ব্যক্তিটি বধূ, শিশু পাশে থাকা সত্ত্বেও আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। পিতা তার সন্তানের মুখ দেখে অনেক দুঃখ ভুলে যান — তিনি বেঁচে থাকার রসদ খুঁজে পান। বলাবাহুল্য, এই কবিতায় তা ঘটেনি। এই কবিতায় কবি ব্যক্তির যন্ত্রণার তীব্রতার মাত্রা বোঝানোর জন্য শিশুটির প্রসঙ্গ এনেছেন। যন্ত্রণা

এত জোরালো যে, শিশু পাশে থাকলেও সে বেঁচে থাকতে আগ্রহী নয়। তবে শক্তি চট্টোপাধ্যায় এই দিক দিয়ে জীবনানন্দ দাশের বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। তিনি লিখেছেন—

“সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমো খাবো”
(যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো? / যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো?)

এই চরণটির মধ্য দিয়ে কবি পিতৃসত্তার বাৎসল্য রস প্রকাশ করেছেন। সন্তানের মুখ ধরে চুমু খাওয়ার অর্থ হল — জীবনপিপাসু ব্যক্তির ভবিষ্যত প্রজন্মকে আঁকড়ে ধরে বাঁচার ইঙ্গিত। পিতা-মাতা সন্তানের মুখ চেয়ে বেঁচে থাকেন — এই কবিতায় সেই শাশ্বত সত্যের দিকটি তুলে ধরেছেন।

বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের কবি শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২ খ্রি. - ২০২১ খ্রি.)-এর কবিতায় উত্তরাধিকার বড়ো জায়গাজুড়ে রয়েছে। তাঁর ‘মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়’ (১৯৭৪ খ্রি.) কাব্যের ‘তিমির বিষয়ে দু-টুকরো’, ‘বাবরের প্রার্থনা’ (১৯৭৬ খ্রি.) কাব্যের নামকবিতা, ‘প্রহরজোড়া ত্রিতাল’ (১৯৮২ খ্রি.) কাব্যের ‘যযাতি’, ‘মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে’(১৯৮৪ খ্রি.) কাব্যের ‘হেতালের লাঠি’, ‘ধুম লেগেছে হৃৎকমলে’(১৯৮৭ খ্রি.) কাব্যের ‘অন্ধবিলাপ’ প্রভৃতি কবিতায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা রয়েছে।

বিশ শতকের ষাট-সত্তর দশক ছিল রাজনৈতিক-সামাজিক প্রভৃতি দিক দিয়ে অস্থিরময় ও ঘটনাবহুল। বিশেষ করে, নকশাল আন্দোলনের দাবদাহতা এই পর্বে ভীষণ প্রভাব বিস্তার করেছে। এই আন্দোলন প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র পুলিশ বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়। জোরালো সংঘর্ষ হয়। অনেক তরতাজা তরুণ-তরুণী পুলিশের গুলিতে অকাতরে প্রাণ হারায়। এই আন্দোলনকারীদের মধ্যে কবি শঙ্খ ঘোষের ছাত্র তিমিরবরণ সিংহও ছিলেন। তিনি মারা যান। ছাত্র সন্তানসম। ছাত্রের মৃত্যুতে পিতা-মাতার মতো শিক্ষকেরও কষ্ট হয়। একই সঙ্গে এই তরতাজা তরুণ-তরুণী অকাতরে চলে যাওয়া কোনো অনুভূতিশীল ব্যক্তির কাছে মেনে নেওয়া সম্ভব নয় — কবির মতো সংবেদনশীল মানুষের পক্ষে তো কোনোভাবেই নয়। ‘তিমির বিষয়ে দু-টুকরো’ কবিতায় পিতৃহৃদয়ের বেদনার কথা উঠে এসেছে—

“ময়দান ভারী হয়ে নামে কুয়াশায়
দিগন্তের দিকে মিলিয়ে যায় রুটমার্চ
তার মাঝখানে পথে পড়ে আছে ও কি কৃষ্ণচূড়া?
নিচু হয়ে বসে হাতে তুলে নিই
তোমার ছিন্ন শির, তিমির।”

শঙ্খ ঘোষের ‘বাবরের প্রার্থনা’ কবিতাটিতে উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ অনেক বেশি সংবেদী। কবিতাটির রচনাকাল ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ। এই কবিতাটি ৬টি স্তবকে, ২৪টি পংক্তিতে — এক বিবেকী সংবেদনশীল কবির অনুভূতিশীল মনের ছোঁয়ায় আমাদের মুগ্ধ করে। এই সময়পর্ব পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের ইতিহাসে এক নিরেট দুঃস্বপ্নের কাল। সারাদেশে জরুরি আবহ, চারিদিকে দম বন্ধ করা পরিবেশ। তরুণ যুবসমাজ অতি ভয়ঙ্কর রক্তস্নাত রাত্রির বিভীষিকায় দিশাহারা। দেশের রাজনীতি তার করাল থাবা মেরে গ্রাস করেছে মানুষের স্বাভাবিক দিনগুলিকে। যেখানে সেখানে গুপ্তহত্যা, হিংসা, গুপ্ত ঘাতকের ছুরি ঝলসে উঠেছিল। গোটা সমাজটাই দিশাহারা — যেন দূরারোগ্য রোগের প্রকোপে শুয়ে আছে মৃত্যুশয্যায়। এরূপ এক প্রতিকূল

পরিবেশের প্রেক্ষাপটে কবির ব্যক্তি জীবনের ব্যক্তিগত দুঃখের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের হেমন্তের সন্ধ্যায় আকস্মিকভাবেই জন্ম হয়েছে এই অসাধারণ কবিতাটির।

এই কবিতাটির লেখার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে শঙ্খ ঘোষ 'কবিতার মুহূর্ত' গ্রন্থে জানিয়েছেন— "বড়ো মেয়েটি বেশ অসুস্থ তখন, ডাক্তারেরা ভালো ধরতে পারছেন না রোগটা ঠিক কোথায়। শুয়ে আছে অনেকদিন, মুখের লাবণ্য যাচ্ছে মিলিয়ে। অথচ তখন তার ফুটে উঠবার বয়স।"[৩] তাই কবির মন খুবই বিষণ্ণ, কোনো কাজে মনোনিবেশ করতে পারছিলেন না। সেরকম এক সন্ধ্যার প্রাক্কালে নির্জন যাদবপুর ক্যাম্পাসে পদচারণা করতে করতে কবির হঠাৎ মনে হয়েছিল — এক ঐতিহাসিক ঘটনার কথা। মুঘল সম্রাট বাবরের পুত্র হুমায়ুন যখন কিছুতেই সুস্থ হচ্ছে না তখন বাবর একদিন নতজানু হয়ে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন ঈশ্বরের কাছে — পুত্রের আরোগ্য কামনা করে। কবি এই তথ্যটির এক নব তাৎপর্য দান করলেন আলোচ্য কবিতাটিতে।

কবিতাটিতে ব্যক্তি মানুষের প্রার্থনা সারা পৃথিবীর অসুস্থ মানুষের রোগ মুক্তির প্রার্থনার প্রতীক হয়ে উঠেছে। শুধু কবির নয়, যে-কোনো পিতার সন্তান আজ রোগশয্যায়। কবি একজন স্নেহময় পিতা রূপে তাদের সকলের রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন। তিনি চান নিজের জীবনের বিনিময়ে সেই তরুণ যুবকদের জীবন মঙ্গলময় হোক—

"এইতো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূন্য হাত—
ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।"

কবি জানেন, ব্যক্তিমানুষ যদি পাপ, হিংসা, লোভকে জয় করে শুদ্ধচেতনাকে ফিরিয়ে আনতে না পারে — তবে একদিন এই বর্বর আগুনের ঝলসানিতে সব পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। অথচ কোনো পিতা, কোনো বিবেকবান মানুষ তা চান না। কোনো সন্তান বৎস্যল পিতা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পিছপা হন না। এভাবে বাৎসল্যরসের সাহায্যে সমাজ সচেতন মানবতাবোধের জাগরণে প্রয়াস দেখিয়েছেন কবি উক্ত কবিতাটিতে।

তাঁর 'যযাতি' কবিতার সঙ্গে মহাভারতের শর্মিষ্ঠা-যযাতি-দেবযানী অংশের যোগসূত্র রয়েছে। শুক্রাচার্যের অভিশাপে যযাতি জরাগ্রস্ত হলে সে শুক্রাচার্যের কাছে মুক্তির উপায় খোঁজে। তখন শুক্রাচার্য জানান, তার কোনো পুত্র যদি জরা গ্রহণ করে তাহলে তিনি জরামুক্ত হয়ে যৌবন ফিরে পাবেন। তারপর তিনি এক-এক করে সকল পুত্রকে জরা নেওয়ার কথা বললে কেউ রাজি হয়নি — একমাত্র পুরু ছাড়া। এরপর অনেকদিন তিনি যৌবনরাজ্যে ভোগ করে বুঝতে পারেন এতে কোনো শান্তি নেই। তখন তিনি পুরুর কাছ থেকে জরা নিয়ে তাকে মুক্ত করেন। এই কবিতায় কবি সমকালের প্রেক্ষাপটে, পৌরাণিক অনুষঙ্গ গ্রহণ করে, উত্তরাধিকারের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন—

"জাতক ও জনকের ঘনিষ্ট কঠিন পরিচয়ে
আপন ফুসফুস নিয়ে নিজেকে আহুতি দিতে গেলে
বিস্ফারিত মুহূর্তের ধাবমান স্বপ্নে চেয়ে দেখি—

কালপুরুষের নীচে মাথা তুলে দাঁড়ায় শহর
যযাতি জীবন পায় মূর্ছিত পুরুর শিরোদেশে।”

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ‘সংবর্ত’(১৯৫৩ খ্রি.) কাব্যের ‘যযাতি’ কবিতায় ঠিক একই পৌরাণিক কাহিনি গ্রহণ করেছেন। যদিও উভয় কবির বিষয় উপস্থাপনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। উভয় কবিতার রচনাকাল এক নয়। সময় ব্যবধান সাহিত্যের বিষয় প্রকাশে ভিন্নতা তৈরি করে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ‘যযাতি’ কবিতাটি হল— পঞ্চাশ উত্তীর্ণ এক ব্যক্তির আত্মবীক্ষারর ইতিহাস। এই আত্মরক্ষায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিকটি উঠে এসেছে। সময়ের বৈরী পরিবেশ পরবর্তী প্রজন্মকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করেছে — এই কবিতায় তার কথা রয়েছে। বিষয় প্রকাশে কবি মহাভারতের পূর্বোক্ত অংশটিকে বেছে নিয়েছেন। কবিতায় কবি লিখেছেন—

“... দেবযানী-শর্মিষ্ঠার কলহকলাপে
আমার অদ্বৈতসিদ্ধি পণ্ড হয়ে থাক বা না থাক,
অকাল জরায় আমি অবরুদ্ধ নই শুক্রশাপে;
অজাত পুরুর সঙ্গে ব্যতিহার্য নয় দুর্বিপাক।”

শঙ্খ ঘোষের ‘হেতালের লাঠি’ কবিতায় মনসামঙ্গল কাব্যের প্রসঙ্গ রয়েছে। বেহুলা-লক্ষিন্দরের বাসর-রাতে মনসার চক্রান্তকে ব্যর্থ করার জন্য চাঁদ সদাগর হেতালের লাঠি নিয়ে পাহারা দেন। সন্তানের জীবন রক্ষার্থে পিতার এই কর্ম শাশ্বত অনুভূতিরই প্রতিবিম্বিত রূপ—

“হেতালির লাঠি নিয়ে বসে আছি লোহার সিঁড়িতে
কালরাত্রি কেটে যাবে ভাবি, ওরা বাসর জাগুক
এমন রাত্রিতে কোনো ফণা এসে যেন না ওদের
শিয়রে কুণ্ডল করে, কেটে যাক প্রেমের প্রহর।”

শঙ্খ ঘোষ ‘অন্ধবিলাপ’ কবিতাটির রচনার প্রেক্ষাপট ‘কবিতার মুহূর্ত’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন— “ ... বিহার থেকে ছুটে এল এক খবর। ন-কাঠা জমির সমস্যা নিয়ে তেইশজন মানুষকে গুলি করে মেরেছে পুলিশ, আরওয়ালে, তিনদিক ঘিরে এক গান্ধীমাঠে, এপ্রিলের উনিশ তারিখ। ... বাড়ি ফিরে এসে, দুদিন ধরে সঙ্গী হিসেবে পাওয়া গেল নতুন একটা লেখাকে। সবসময়েই তখন মনে মনে ফিরছে এই ধর্মক্ষেত্র, রণক্ষেত্র!”[৪] এই লেখাটিই হল — ‘অন্ধবিলাপ’ কবিতাটি। মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়ের কাছ থেকে মহাভারতের সমগ্র কথা শুনেন। তিনি ছিলেন পুত্রস্নেহে অন্ধ। তাই দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তিনি তাদের পক্ষ নেন। তার মধ্যে রয়েছে সন্তানের জন্য আকুতি। সন্তান বৎস্যল পিতা হিসাবে তিনি স্মরণে আসেন। কবি শঙ্খ ঘোষ এই কবিতায় মহাভারতের উক্ত অনুষঙ্গটি গ্রহণ করেছেন—

“দুষ্টে বলে, মনে মনে তারা আমার কেউ না কি নয়
সেটাও যদি সত্যি হয় তো একাই একশো আমার ছেলে”।

কবি বিষ্ণু দে ‘ঈশাবাস্য দিবানিশা’(১৯৭৪ খ্রি.) কাব্যের ‘ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ’ কবিতায় মহাভারতের অনুষঙ্গ লক্ষ করা যায়। শত পুত্রকে হারিয়ে ধৃতরাষ্ট্র তার ভুল বুঝতে পারেন। এই কবিতায় ধৃতরাষ্ট্রের হৃতকর্মের প্রতি বিলাপ ফুটে উঠেছে—

"— ওরাই কি এক-নূন্য শতপুত্র? নীলাকাশে ও কি লক্ষ তারা?"

বিশ শতকের সত্তরের দশকের একজন প্রথিতযশা কবি হলেন তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। 'ভাবনায় সাম্প্রতিক শব্দগুলি'(১৯৭১ খ্রি.), 'সাদা পায়রার মমি'(১৯৮৭ খ্রি.), 'রুনা সিরিজ'(১৯৮৮ খ্রি.), 'সাতটি কাব্যগল্প'(১৯৯৬ খ্রি.), 'মোমবাতির আলোয় প্রেম'(২০০১ খ্রি.), 'তন্ত্রপদাবলি'(অপ্রকাশিত গ্রন্থ), 'একগুচ্ছ রক্তকরবী : নন্দিনীকে'(২০০৫ খ্রি.), 'দাঁড়িয়ে, রইলে কেন, চলো'(২০১৪ খ্রি.), 'বিষের বচন'(অগ্রন্থিত কবিতা ২০১৫-১৬), 'কবিতা'(২০১৭ খ্রি.) তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র 'ভূমিকা'য় কবি বলেছেন— "একজন কবিই হব এই ছিল আশৈশব লক্ষ্য, কখন যে গদ্যের টানে হয়ে গেছি ঔপন্যাসিক ও গল্পকার সেই সন্ধিক্ষণ আমার নিজেরও স্মরণে নেই। অথচ প্রাথমিকে পড়ার সময় থেকেই পদ্য লেখার শুরু, তারপর কবিতা লেখার মুসাবিদা। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াপড়ির দিনগুলিতে এমন দিন কমই গেছে যেদিন কোনও কবিতা লিখিনি। তবে ছাপাছাপির কথা ভেবেছি অনেক পরে যতক্ষণ না পায়ের তলায় খুঁজে পেয়েছি মাটি।"[৫] কবিতা ও কথাসাহিত্য সাহিত্যের উভয় শাখা তিনি গান্ডীবধারী সব্যসাচীর মতো সমানতালে চালনা করেছেন। তাই তাঁর কবিতার মধ্যে গদ্যের চলন অনুভব করা যায়। কবি তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ বড়ো জায়গা দখল করেছে। সমকালের প্রতিকূল পরিবেশ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর কেমন প্রভাব বিস্তার করেছে, পিতা-মাতার কর্তব্য সন্তানদের প্রতি কেমন, সমাজের ব্যভিচার উত্তরাধিকারদের গঠনে কেমন ভূমিকা নিয়েছে — এসব বিষয় তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে। 'ভাবনায় সাম্প্রতিক শব্দগুলি'(১৯৭১ খ্রি.) কাব্যের 'উত্তরাধিকার' কবিতায় বীভৎস সমাজে ব্যভিচার যে হিংস্র থাবা বসিয়েছে সেই দিকটি প্রকাশ পেয়েছে—

"শিরার খাঁড়িতে ঘোরেফেরে পূর্বপুরুষের সোপান বেয়ে গড়িয়ে পড়া রক্ত
যা স্বভাবের অভিভাবক যার কাছে ইচ্ছাও বশীভূত
কারও রক্তে সন্ন্যাসীর উদাসীন হাওয়া
খুনি পিতার রক্ত বওয়া কারও হাত গোপন বারান্দায় নিসপিস করে
বেশ্যার পুত্র জাহান্নমে চলে যায় পিতৃত্বের খোঁজে;"

পরবর্তী প্রজন্ম দেশের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ — যাদের হাত ধরে রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের অগ্রগতির চাকা অগ্রসর হয়। দেশকে সুন্দরভাবে চালনা করতে, এগিয়ে নিয়ে যেতে এদের কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। তাই এদেরকে সু-পরিবেশ দেওয়া জরুরি। তবে সমকালের বৈরী পরিবেশ, ব্যভিচারী সমাজব্যবস্থা এদেরকে সঠিক পরিচর্যা দেয় না — যা ভবিষ্যতের পক্ষে ক্ষতিকারক। কবি দেশ-কাল-সমাজের নগ্ন পরিবেশে উত্তরাধিকারীরা কেমন ভাবে বড়ো হচ্ছে, তাদের মানসিকতা কেমন, পিতার চারিত্রিক স্খলন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পক্ষে কেমন অপ্রীতিকর — এসব বিষয় উক্ত কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। 'সাতটি কাব্যগল্প'(১৯৯৬ খ্রি.) কাব্যের 'উত্তরাধিকার' কবিতায় ব্যক্ত করেছেন সন্তানের জন্ম কিভাবে হয়, সন্তানের চরিত্রচিত্রণ, গায়ের রং, চোখ, চুলের বাহার, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি বিষয় বংশপরম্পরায় ঘটে সেদিকটিও উক্ত কবিতায় প্রকাশ করেছেন—

"কেননা মানবসন্তান ফিরে-ফিরে আসে রক্ত পরম্পরা ধরে
কেননা মানুষ তার নারীর গর্ভেই ফেরে পুনর্জন্মের অভিলাষে;"

কবি জানিয়েছেন, বংশপরম্পরায় শান্ত-শিষ্ট মানসিকতার বহনকারী হলেও উত্তরসূরী নিষ্পাপ না হয়ে হত্যাকারী হচ্ছে — এর কারণ হল সমকালের বৈরী সমাজ পরিবেশ। যখন বীভৎস সভ্যতা কীটদষ্ট হয় তখন

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নষ্ট হয়ে যায়। একজন আদর্শ শিশু গঠনে সমাজের ভূমিকা ব্যাপক। তাই সমাজ যদি দূষিত হয় তাহলে সে সমাজ থেকে কোনো সুস্থ শিশু বেঁচে থাকবে না — মানসিক অসুস্থতার শিকার হয়। কবি দুঃখের সঙ্গে শিশুর এই অস্বাভাবিক আচরণ উক্ত কবিতায় তুলে ধরেছেন—

"ক্রমবিবর্তনের পথে ক্রমাগত সভ্য হতে হতে
সমগ্র সভ্যতা আজ অসভ্য হয়েছে
তার প্রতিকোষে পারিপার্শ্বিক থেকে সংক্রমিত লক্ষ ভাইরাস
তার শিরায় কোটি ব্যাকটেরিয়ার দুরারোগ্যব্যাধি
এভাবেই পুনর্জন্ম হয় মানুষের
এভাবেই মানুষের উত্তরাধিকার হাঁটে দীর্ঘ মিছিলের পিছুপিছু
অন্য কারওকে উত্তরাধিকার দেবে বলে।"

কবি মৃদুল দাশগুপ্ত বিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে কবিতাচর্চা শুরু করেন। 'জলপাইকাঠের এসরাজ'(১৯৮০ খ্রি.), 'এভাবে কাঁদে না'(১৯৮৬ খ্রি.), 'গোপনে হিংসার কথা বলি'(১৯৮৮ খ্রি.), 'সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ'(১৯৯৮ খ্রি.), 'ধানখেত থেকে'(২০০৭ খ্রি.), 'সোনার বুদ্বুদ'(২০১০ খ্রি.) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য। তাঁর কবিতায় যেমন রয়েছে সময় ও সমাজের প্রতি ক্রোধ ও অভিমান তেমনই তার পরিবেশনে কবি শিল্পবোধে উত্তীর্ণ। "সময়কে তিনি যেমন বাস্তবতার ভিতরে দেখেন, তেমনি আবার অবচেতনের এক শিল্পময় উদ্ভাসে গড়ে তোলেন এবং এক সংবেদী ভুবন।"[৬] তাঁর 'জলপাইকাঠের এসরাজ'(১৯৮০ খ্রি.) কাব্যের কবিতাগুলিতে নকশাল আন্দোলনের ভয়াবহ দিনগুলি তথা উত্তাল সত্তরের বীভৎস পরিবেশ উপস্থিত হয়েছে। উত্তাল সত্তরে কত তরুণ অকালে প্রাণ হারাচ্ছে, কত মায়ের কোল খালি হচ্ছে, কত পিতা সন্তান হারা হচ্ছেন তার কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। প্রতিকূল পরিবেশের যাঁতাকলে পড়ে কত যুবক যে পৃষ্ঠ হচ্ছে তার কোনো ইয়াত্তা নেই। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আজ যে করালগ্রাসের মধ্যে জীবন অগ্রসর করছে তার কথা কবি উক্ত কাব্যের 'আগামী' কবিতায় প্রকাশ করেছেন—

"ধরো, সেদিনও এমনই রাত, জালিয়ানওয়ালাবাগে
ডায়ারের বন্দুক নিয়েছে কেড়ে সোনার টুকরো ছেলে
দ্রোণাচার্য ঘোষ !
ভাবো, ভাবো সেদিনের উৎসব ! বরানগরের গঙ্গার জল থেকে
আবার এসেছে উঠে
তিনশো তরুণ"।

নকশালপন্থী আন্দোলনের এক অসমাপ্ত পরিণতি বাংলা কবিতার আবহমণ্ডলে জন্ম নিয়েছিল অনন্ত দীর্ঘশ্বাসের। অপ্রাপ্তির বেদনা আর স্বজন হারানোর কান্নায় ভারী হয়ে উঠেছিল বাংলা কবিতা। রাষ্ট্রশক্তির নির্মম নিষ্পেষণে আর দমন পীড়নে স্তব্ধ হয়ে যাওয়া ব্যথিত হৃদয় যন্ত্রণার কথা উক্ত সময়ের কবিতায় উপস্থাপিত হয়েছে বহুরৈখিক বিন্যাসে। সত্তর দশকের কবি সুব্রত রুদ্রের কবিতায় সমসময়ের অস্থিরতার আঁচ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। সামাজিক নিষ্ঠুরতা, সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা তাঁকে আহত করেছে বারে বারে — যা তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। "তাঁর কবিতার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে বারে বারে মনে হয় সেদিনের সেই অশান্ত যুবকদের একজনই যেন তিনি। … সে বিশ্বাস করে শিরদাঁড়া সোজা রেখে সময়টাকে

চিনতে না পারলে কবিতা লেখা যায় না। তাঁর কবিতায় পঁচাত্তরের দিনগুলির কথা উঠে এসেছে নানাভাবে। ... সুব্রত রুদ্র কোথাও কবিতার মধ্যে এক ধরনের তেজস্বী সততার সন্ধান করে ফিরেছেন। যে লেখা স্রষ্টার সর্বনাশ হবে জেনেও তৈরি হবে, যে লেখা সমাজের নগ্নতার দিকে আঙুল তুলবে, যে কথা দুরাশা জেনে ঠোঁটে আটকে যায়, সুব্রতর কাছে তারই নাম কবিতা।”[৭] ‘গাঢ়তম ছায়া’, ‘বেঁচে থাকবে কেন’, ‘স্তব্ধতার পড়াশুনো’, ‘যমপুরীতে কবিতা’, ‘জীবন্ত শাদা’, ‘হাসতে শিখেছে গম্বুজ’, ‘আগুনে কে পোড়াবে তোমাকে’, ‘অন্ধ প্রেমিক’, ‘পিঠফেরানো ময়ূর’, ‘আত্মহুতির দিন’, ‘দেশ তো একটা বাড়ি’, ‘জলফড়িঙের চোখে’ প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য। কবি তাঁর ‘যমপুরীতে কবিতা’ কাব্যের ‘উত্তরাধিকার’ কবিতায় সমকালের কর্কসধ্বনি পরিবেশন করেছেন। দেশ-কাল-সমাজে যখন বিপন্ন হয় তখন পরিবারের সকলে সেই বিপন্নতাকে রোধ করতে বদ্ধপরিকার হয়। কবিতায় কবি জানিয়েছেন, সিংভূমের গুনু যে মিশনারি স্কুলে পড়তো সে সেখান থেকে পালিয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে। কবি লিখেছেন—

“ওর বাপ জেল খেটেছে
ওর দাদা পরেছে ফাঁসির দড়ি
ও কেন ছাড়বে?”

দেশের প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবিলা করতে বংশপরম্পরায় এগিয়ে আসতে হয়। দেশের মঙ্গল বা কল্যাণার্থে যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সবসময় তৈরি এবং তারা তাদের জীবন সমর্পণ করতেও দ্বিধাবোধ করে না — এই কবিতায় কবি সেই দিকগুলি উন্মোচিত করেছেন।

নারী হৃদয়ের অব্যক্ত যন্ত্রণা, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অসহায় করুণ কাহিনি, লিঙ্গ বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থা, রাজনৈতিক-সামাজিক জীবনে নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করা, কন্যাভ্রুণ হত্যা প্রভৃতি এক কথায় নারীর কণ্ঠস্বর যিনি কবিতায় সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন তিনি হলেন কবি কৃষ্ণা বসু। তিনি তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ গ্রন্থের ‘ভূমিকা’ অংশে নিজ কবিতার বিষয়ভাবনা ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছেন— “যাপিত জীবন আমার মধ্যে নানাভাবে অভিঘাত তৈরি করে, সেই অভিঘাতে অভিভূত আমি নিরুপায় বসে পড়ি লেখার টেবিলে, এর চেয়ে বড় পরিত্রাণ জানিনি জীবনে। আমার বিশ্বাস শিল্পের, কবিতা শিকড় উত্তরাধিকারের এবং আধুনিকতার, দুই মাটিতে প্রোথিত। সুদীর্ঘ দিনধরে আমাদের সমাজে নারীর প্রতি সব রকমের লাঞ্ছনা অপমান, এই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার যত রকমের ভুল, মেয়েদের ওপর নিষ্ঠুরতা দমন পীড়ন তার রক্ত ক্ষত দাহ আমি টের পাই, চেষ্টা করি তাদের শব্দে ধরতে। জানিনা পারি কিনা। এছাড়া বহুবর্ণময় এই জীবনও আমাকে টানে এবং কবিতায় উঠে আসে।”[৮] তাঁর কবিতায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতি ব্যাঙ্গার্থক দৃষ্টিভঙ্গি বেশি প্রকাশ পেয়েছে। তবে তাঁর ‘বুড়ি মা’ কবিতায় অন্য স্বর ব্যক্ত হয়েছে। সমাজ সংসারে দেখা যায় পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের ভালো রাখার জন্য কতই কিনা করেন। তারা সবসময় চান সন্তান যেন ঠিক থাকে। সন্তান বা উত্তরাধিকারকে সার্বিকভাবে সুরক্ষিত রাখার জন্য তাদের চেষ্টার শেষ নেই। তারা মনে করেন সন্তানই হল তাদের পরিচয়বাহক এবং শেষ আশা-ভরসা। সন্তানরা বড়ো হয়ে তাদের পিতা-মাতার প্রতি সব সময় সঠিক ব্যবহার করে না। তাদের ছেড়ে বৌ বাচ্চাকে নিয়ে শহরে পাড়ি জমায়। এই কবিতায় কবি সেই দিকটি উন্মোচন করতে চেয়েছেন। কবিতায় দেখা যায়— একজন বুড়ি মা একা গ্রামের একটি ভাঙা বাড়িতে থাকেন। তার ছেলে চাকরি পেয়ে শহরে স্ত্রীকে নিয়ে থাকে। তার ঘরে আসবাবপত্র প্রচুর।

তিনি বৃদ্ধা মাকে দু দশ টাকা মাসে মাসে মাসোহারা দেন। এখানেই তার দায়িত্ব শেষ। এদিকে তার মা নিঃসঙ্গ অবস্থায় বিভিন্ন অসুখ-বিসুখসহ জীবন-যাপন করে। পরে সেই মা মারা গেলে—

“তের দিন পর সেই মাতৃশোকাতুর
বাড়ি বাড়ি বিলি করে গাড়ি নিয়ে শ্রাদ্ধ
বাসরের চিঠি, তলায় নিজের নাম,
তার আগে লেখা আছে ‘ভাগ্যহীন’, ঠিক!”

—এই ‘ভাগ্যহীন’ শব্দটির উপর কবি বেশি জোর দিয়েছেন। যে ছেলে মায়ের জীবিত কালে সন্তানের কর্তব্য পালন করে না তার কাছে এসব বেমানান। অন্য কবিরা তাঁদের কবিতায় উত্তরাধিকারের প্রতি পিতা-মাতা, সমাজের দায়িত্বের কথা বলেছেন। উত্তরাধিকারীরা নগ্ন সমাজব্যবস্থার যাঁতাকলে পড়ে তাদের গতি পরিবর্তন হয়েছে — সেই দিকগুলির কথাও বলেছেন। এদিক দিয়ে কবি কৃষ্ণা বসু স্বতন্ত্র পথের পথিক। তিনি দেখিয়েছেন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের পিতা-মাতাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে সেই দিকটি। যদিও এইসব বিষয় কথাসাহিত্যে বেশি প্রকাশ পেয়েছে তবুও বলতে হয় কৃষ্ণা বসু উক্ত বিষয়টি কবিতায় এনে নতুনত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

এভাবে আলোচনা করে দেখা যায়, আধুনিক বাংলা কবিতায় উত্তরাধিকারের প্রসঙ্গ বহুরৈখিকভাবে উঠে এসেছে। ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রতি ভালোবাসা প্রত্যেক সমবেদনশীল মানুষের মধ্যে লক্ষ করা যায়। কবিরা উক্ত বিষয়টি কখনো ইতিহাসের পটভূমিতে, আবার কখনো পৌরাণিক অনুষঙ্গের সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন। অনেক কবি বৈরী পরিবেশ থেকে নব প্রজন্মকে রক্ষা করার আকুতি জানিয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

1) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী(ষষ্ঠ খণ্ড), কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ৮২৬
2) শহীদ কাদরীর কবিতা, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ: জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৭
3) শঙ্খ ঘোষ, কবিতার মুহূর্ত, অনুষ্টুপ, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ: ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ. ৬১
4) প্রাগুক্ত সূত্র - ৩, পৃ. ৯৪-৯৫
5) তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০১৯, পৃ.৭
6) অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়(সম্পাদিত), আধুনিক কবিতার ইতিহাস, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে’জ সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ২২৮
7) রিয়া চক্রবর্তী, বাংলা কবিতায় নকশাল আন্দোলন, বলাকা, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা, সম্পাদক ধনঞ্জয় ঘোষাল, কলকাতা, ২০১৩ খ্রি., পৃ. ১৬৪
8) কৃষ্ণা বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৯, পৃ. ৭

গ্রন্থপঞ্জি:

1) কৃষ্ণা বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০১৯
2) জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ: জানুয়ারি ২০২০
3) তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০১৯
4) বিষ্ণু দে, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, একাদশ সংস্করণ: মার্চ ২০২০
5) বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ: মে ২০১৯
6) মৃদুল দাশগুপ্ত, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০২১
7) শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ত্রয়োদশ সংস্করণ: জুলাই ২০১৭
8) শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, কলকাতা, ১৯৯৪ খ্রি.
9) শহীদ কাদরীর কবিতা, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ: জানুয়ারি ২০১০
10) সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুকান্ত-সমগ্র, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ৩১ শে শ্রাবণ ১৩৬৪
11) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ত্রিংশ সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৮
12) সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ২০১১
13) সুব্রত রুদ্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০০
14) সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৮